॥ শ্রীহরিঃ ॥

মূর্তিপূজা

আমাদের সনাতন বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ভক্তগণ মূর্তিপূজা করেন না, তাঁরা পরমাত্মার পূজা করেন। বিশেষত্ব হল এই যে, যে পরমাত্মা ব্যাপ্তিস্বরূপ, তাঁকে বিশেষভাবে অনুধ্যান করার জন্যই মূর্তি তৈরি করে, ঐ মূর্তির মধ্যেই ধ্যান এবং চিন্তন করা সহজসাধ্য হয়।

যদি মূর্তিরই পূজা করা হোত তাহলে পূজকের ভিতর সেই পাথরের মূর্তি সম্পর্কে এরূপ ভাব হোত যে, 'হে প্রস্তরখণ্ড তুমি কোনো একটি পর্বত হতে এসেছ, কোনো এক ব্যক্তি তোমায় তৈরি করেছে, কোনো এক ব্যক্তি দ্বারা তোমাকে এখানে আনা হয়েছে। অতএব হে প্রস্তরদেব ! তুমি আমার কল্যাণ করো।' কিন্তু এমন তো কেউ বলে না, তাহলে মূর্তির পূজা কীভাবে হল ? ভক্তেরা মূর্তির পূজা করেন না, তাঁরা মূর্তিতে ভগবানেরই

পূজা করেন অর্থাৎ মূর্তিভাব দূর করে ভগবৎভাবে পূজা করেন। এইভাবে মূর্তিতে ভগবানের পূজা করলে সর্বত্রই ভগবানের অনুভব হয়। ভগবৎপূজায় ভগবানের প্রতি ভক্তিভাবের প্রথম সঞ্চার হয়। পরে ভক্ত সিদ্ধ হয়ে গেলেও তাঁর দ্বারা ভগবানের পূজা চলতেই থাকে।

মূর্তিরূপে তাঁকে পূজার বিষয়ে গীতায় ভগবান বলেছেন, 'ভক্তগণ ভক্তিপূর্বক আমাকে প্রণাম করে আমার পূজা করেন (৯।১৪)', 'যে ভক্তগণ শ্রদ্ধা এবং ভক্তিপূর্বক পত্র-পুষ্প, ফল-জল ইত্যাদি আমাকে অর্পণ করেন, তাঁদের দেওয়া উপচার আমি গ্রহণ করে থাকি' (৯।২৬)। দেবতা (বিষ্ণু-শিব-শক্তি-গণেশ-সূর্য ঈশ্বরকোটির শ্রেণীর এই পঞ্চ দেবতা), ব্রাহ্মণ, আচার্য, মাতা-পিতা প্রমুখ গুরুজন এবং জ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের পূজা করাকে শারীরিক তপ বলা হয় (১৭।১৪)। যদি সম্মুখে এঁদের মূর্তি না থাকে তাহলে কাকে নমস্কার করা হবে ? কাকে পত্র-পুষ্প, ফল-জল ইত্যাদি প্রদান করা হবে, কারই বা পূজা করা হবে ? এতে এই প্রমাণিত হয় যে, গীতায় মূর্তিপূজার কথাও বলা হয়েছে।

এইরূপ গাভী, তুলসী, অশ্বত্থ, ব্রাহ্মণ, তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, গিরিগোবর্ধন, গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদিকে পূজা করা প্রকৃত অর্থে ভগবানকেই পূজা করা। এঁদের পূজা করলে 'সমস্ত স্থানেই পরমাত্মা আছেন', এই কথা অতি সরলভাবে অনুভব করা যায়। অতএব সর্বত্র পরমাত্মাকে অনুভব করতে গাভী প্রভৃতির পূজা অত্যন্ত সহায়ক হয়। কেননা যে পূজা করে, 'সর্বত্রই পরমাত্মার অধিষ্ঠান' এই কথা সে মানতে আরম্ভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি পূজার ধারে-কাছেও যায় না, কেবল বাক্সর্বস্ব, তার পক্ষে 'সর্বত্র পরমাত্মার অধিষ্ঠান' এই অনুভব করা খুব কঠিন। বিশেষত্ব এই যে মূর্তিদ্বারা ভগবৎপূজন, কল্যাণের এবং শ্রেয়ের সাধন।

ভগবৎপূজন ছাড়া অস্থি-মাংসের পূজা অর্থাৎ নিজ শরীরকে দামী দামী অলংকার ও কাপড় দিয়ে সাজানো, নিজ গৃহ সুন্দর ভাবে তৈরী করা, সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র দিয়ে মনোহর রূপে সাজানো—এও এক প্রকারের মূর্তিপূজা। কিন্তু এই পূজা মানুষের অধঃপতন করে।

জ্ঞাতব্য

প্রায় সব আস্তিক ব্যক্তিই মানেন যে ভগবান সর্বত্র

পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। বাস্তবিক পক্ষে এটা তাঁরাই মানেন যাঁরা মূর্তি, বেদ, সূর্য, অশ্বত্থ, তুলসী, গাভী ইত্যাদিকে ভগবান মনে করে পূজা করছেন। কারণ যাঁরা ঐসব বস্তু এবং প্রাণীতে ভগবান আছেন বলে মনে করেন, তাঁরা স্বতঃই সকল বস্তু এবং সকল প্রাণীতে ভগবানের উপস্থিতি রয়েছে বলে মেনে নেবেন। যাঁরা মনে করেন কেবল মূর্তিতেই ভগবান আছেন তাঁদের 'প্রাকৃত (আরম্ভিক) ভক্ত বলা হয়[১] কেননা তাঁরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ভগবানের পূজা শুরু করেছেন। অতএব তাঁরা মূর্তিতে ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন করেছেন' কিন্তু যিনি 'ভগবান সর্বত্র আছেন' —এইরূপ বলেন অথচ তাঁর মধ্যে কোনো কিছুর প্রতিই ভালোবাসার ভাব, পূজার ভাব, শ্রেষ্ঠত্বের ভাব কিছুমাত্র নেই, তাঁকে ভক্ত বলা যাবে না, কেননা তিনি শুধু কথার কথা বলেন যে 'ভগবান সর্বত্র আছেন', সত্যিই তা তিনি মানেন না, অতএব এই ব্যক্তি ভগবানের সম্মুখীন হননি।

[১]অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৭)

মূর্তিতে ভগবানের পূজা শ্রদ্ধার বিষয়, তর্কের নয়। যাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, তাঁর কাছে ভগবানের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। তাঁর পূজা ভগবান গ্রহণ করেন, তাঁর হাত থেকে খাবার গ্রহণ করেন। যেমন ভক্তিমতী করমাদেবীর কাছ থেকে নিয়ে ভগবান খিচুড়ি খেয়েছিলেন, ধন্না ভক্তের থেকে পরোটা খেয়েছিলেন, ভক্তিমতী মীরার হাত থেকে দুধ খেয়েছিলেন ইত্যাদি। এর বিশেষত্ব এই যে শ্রদ্ধা ও ভক্তিদ্বারা ভগবান মূর্তির মধ্যে জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করেন।

প্রশ্ন—ভক্তেরা ভগবানকে যে ভোগ অর্পণ করেন, তা যে ভগবান গ্রহণ করেন তার প্রমাণ কী ?

উত্তর—ভগবানের দরবারে বস্তুর প্রাধান্য নেই, আছে ভাবের প্রাধান্য। ভাবের জন্যই ভগবান ভক্তের অর্পিত বস্তু এবং পূজাদি ক্রিয়াকর্ম স্বীকার করেন। ভক্তের যদি ভাব হয় ভগবানকে খাওয়াবার তাহলে ভগবানেরও খিদে পায় এবং তিনি প্রকট হয়ে ভোজন করেন। ভক্তের ভাবে বা ভালোবাসাতে ভগবান যে বস্তু গ্রহণ করেন, সে বস্তু আর বিকারগ্রস্ত হয় না, তা দিব্য বা চিন্ময় হয়ে যায়। যদি এইরূপ ভাব না-ও হয়, কিছুটা ন্যূণতা থাকে, তাহলেও ভক্ত ভোগ অর্পণ করলেই ভগবান সন্তুষ্ট হন।

ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বস্তু বা ক্রিয়ার প্রাধান্য নেই, শুধু ভাবেরই প্রাধান্য আছে। সাধুরা বলেন—

ভাব ভগত কী রাবড়ী, মীঠী লাগে 'খীর'।
বিনা ভাব 'কালূ' কহে, কড়বী লাগে খীর॥

আমার সঙ্গে এক ব্যক্তির দেখা হয়েছিল। সেই ব্যক্তির একজন সাধুর উপরে খুব শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সাধুর খুব যত্ন করতেন। তিনি বলতেন, 'সাধুর যখনই পিপাসা পেয়েছে বলে আমার মনে হতো তখনই আমি জল নিয়ে যেতাম এবং তিনি জল পান করতেন।' সেইরূপ যাঁরা পতিব্রতা রমণী, তাঁরাও স্বামীর ক্ষুধা-তৃষ্ণার খবর ঠিক মতো বুঝতে পারেন এবং স্বামী কী খেতে ভালোবাসেন তাও তাঁরা বুঝতে পারেন। স্বামী কিছু খেতে চাইলে তিনিও বলে ওঠেন, 'আজ আমার এইটাই খাবার ইচ্ছা হয়েছিল।' এইভাবেই যাঁর মনে ভগবানকে ভোগ দেবার আন্তরিক বাসনা হয় স্বতঃই তাঁর মনে ভগবানের রুচি এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিষয়ে ধারণা হয়ে যায়।

এক মন্দিরে একজন পূজারী ছিলেন। তাঁর ইষ্ট ছিলেন গোপাল। তিনি রোজ ছোট্ট ছোট্ট করে লাড্ডু বানাতেন এবং রাত্রে যখন গোপালকে শয়ন করাতেন,

তখন মাথার কাছে সেই লাড্ডু রেখে দিতেন, কারণ বালকের রাত্রে ক্ষুধা পেয়ে যায়। একদিন পূজারী লাড্ডু রাখতে ভুলে যান, তখন গোপাল পূজারীকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং বলেন যে তাঁর ক্ষিধে পেয়েছে। এইরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক সাধু ছিলেন। ইনি প্রতিবছর দেওয়ালীর পর শীতকালে ভগবানকে কাজুবাদাম, পেস্তা, আখরোট ইত্যাদির ভোগ দিতেন। ক্রমে কাজুবাদাম ইত্যাদির দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় তিনি চীনাবাদাম দিয়ে ভোগ দিতে শুরু করলেন। একদিন রাত্রে ভগবান তাঁকে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, তুই আমাকে শুধু চীনাবাদামই খাওয়াবি ?' সেইদিনের পর থেকে পূজারী পুনরায় ভগবানকে কাজু ইত্যাদি দিয়ে ভোগ দিতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে তাঁর মনে কিছু দ্বিধা ছিল যে, 'কি জানি ভগবান ভোগ গ্রহণ করেন কিনা ?' যখন ভগবান স্বপ্নে এইভাবে বললেন তখন তাঁর দ্বিধা দূর হল। এর তাৎপর্য এই যে, কেউ শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানকে ভোগ নিবেদন করলে ভগবানও তা আনন্দে গ্রহণ করেন।

একজন সাধুর আহার অত্যন্ত বেশি ছিল। একবার তাঁর দেহ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোনো এক ব্যক্তি তাঁকে

পরামর্শ দেয় যে, 'মহারাজ ! আপনি গোরুর দুধ খান এবং বাছুরটি দুধ খাওয়ার পর যেটুকু বাঁচবে সেইটুকুই খাবেন।' তিনি সেইরূপ করতে লাগলেন। গোবৎস পেট ভরে দুধ খাওয়ার পর তিনি গোরুর দুধ দোহাতেন, তাতে মাত্র একপো বা দেড়পো দুধ পেতেন, কিন্তু তাতেই তাঁর পেট ভরে যেত। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর অসুখ সেরে গেল এবং তিনি সুস্থ হলেন। যদি ন্যায়সঙ্গত বস্তুতেও এতো শক্তি থাকে যে অল্পমাত্রায় গ্রহণ করলেও তৃপ্তি হয় এবং অসুখ সেরে যায় তাহলে যে বস্তু ভাবপূর্বক দেওয়া হয় তার সম্বন্ধে কিছু আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সকলেই অনুভব করে থাকেন যে কেউ যদি ভাব দ্বারা বা অনুরাগ সহকারে ভোজন করায় তাহলে সেই আহারে সুস্বাদ পাওয়া যায় এবং সেই আহার দ্বারা বৃত্তিসকলও ভালো থাকে। শুধু মানুষের ওপর নয়, পশুদের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। যে গোবৎসের মা-গাভীটি মারা যায়, লোকে তাকে অন্য গাভীর দুধ খাওয়ায়, তাতে সেই বাছুরটি বেঁচে যায় ঠিকই কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট হয় না। কিন্তু যদি সেই গোবৎসটি তার নিজের মায়ের দুধ খেত তাহলে অল্প দুধেও সে হৃষ্টপুষ্ট হতো, কেননা তার মা তাকে দুধ খাওয়াবার সময় আদর করত, স্নেহভরে গা চেটে দিত, সেই ভালোবাসাতে বাছুরটি যথেষ্ট পুষ্ট হোত। যদি মানুষ বা পশুর ওপরেও ভাবের প্রভাব পড়ে তাহলে অন্তর্যামী ভগবানের ওপরেও যে ভাবের প্রভাব পড়বে তাতে আর বলার কী আছে ? বিদুরের স্ত্রীর এইরূপ ভাব ছিল বলেই ভগবান তাঁর হাত থেকে কলার খোসা পর্যন্ত খেয়েছিলেন। গোপিনীদের এইভাব ছিল বলেই ভগবান তাঁদের হাত থেকে কেড়ে দই, মাখন খেয়েছিলেন। শ্রীব্রহ্মাকে ভগবান বলছেন—

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং চক্ষুষা গৃহ্যতে ময়া।
রসং চ দাসজিহ্বায়ামশ্নামি কমলোদ্ভব॥

'হে কমলোদ্ভব ! আমার সামনে অর্পিত ভোগসমূহ আমি নেত্রদ্বারা গ্রহণ করি ; কিন্তু তার স্বাদ আমি ভক্তদের জিহ্বাদ্বারাই গ্রহণ করি।'

সাধুদের কাছে শুনেছি যে, আন্তরিকতার সঙ্গে অর্পিত ভোগদ্রব্য ভগবান কখনো দৃষ্টিদ্বারা, কখনো স্পর্শদ্বারা আবার কখনো স্বয়ং উপস্থিত হয়ে গ্রহণ করে থাকেন।

হামাগুড়ি দেওয়া শিশু কোনো বস্তু নিয়ে তার বাবাকে দিলে যেমন তিনি খুব খুশি হন এবং অনেক উঁচুতে হাত দেখিয়ে বলেন, 'বাছা, তুমি এতবড় হও,

অর্থাৎ, আমার থেকেও বড় হয়ে ওঠ।' কেন, বস্তুটি কি পিতার নিকট অলভ্য ছিল যে শিশুটি সেটি দেওয়ায় তার বাবা বিশেষ কিছু পেলেন ? না, তা নয় ! কেবল শিশুর দেবার ভাবটি দেখে বাবা প্রসন্ন হলেন। এইরূপ ভগবানেরও কোনো কিছুর অভাব নেই, অথবা তাঁর কোনো কিছু প্রাপ্তিরও ইচ্ছা নেই, কেবল ভক্তের আন্তরিকতার জন্যই তিনি প্রসন্ন হন। কিন্তু যারা লোক দেখানোর জন্য বা লোক ঠকানোর জন্য মন্দির সাজায়, ভগবানের বিগ্রহ সাজায়, ভালো ভালো জিনিস দিয়ে ভোগ অর্পণ করে, তাদের নৈবেদ্য ভগবান গ্রহণ করেন না। কেননা তা ভগবানের প্রকৃত পূজা নয়, সেটি আসলে ব্যক্তিগত স্বার্থের ও অর্থেরই পূজা।

যেভাবেই সম্ভব হোক না কেন, যাঁরা ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেন এবং তাঁর পূজা-অর্চনা করেন, এইরকম ব্যক্তিকে যারা পাষণ্ড বলে এবং অহংকারবশত ভাবে, 'আমি ওদের চেয়ে ভালো, আমি পাষণ্ড নই' —তাদের কখনো কল্যাণ হয় না। যে সব ব্যক্তি যে ভাবেই হোক না কেন, কোনো উত্তম কর্ম করেন তাঁদের কাজের সেই অংশ তো ভালো হয়ই, তাঁদের ব্যবহার, চলাফেরার মধ্যেও মহত্ত্ব প্রকাশ পায় । কিন্তু যারা অহংকারবশত উত্তম ব্যবহার পরিত্যাগ করে, পরিণামে তাদের অকল্যাণই হয়।

প্রশ্ন—অসৎ ব্যক্তিগণ যখন মূর্তি ভেঙে ফেলে তখন ভগবান নিজের প্রভাব ও অলৌকিকত্ব কেন প্রদর্শন করেন না ?

উত্তর—মূর্তির উপর যার কোনো ভালোবাসা নেই, যার মূর্তিপূজকের উপর হিংসাভাব থাকে, এবং হিংসাভাব নিয়ে যারা মূর্তি ভেঙে ফেলে, তাদের উপর ভগবান তাঁর প্রভাব এবং মহিমা কেনই বা প্রকাশিত করবেন ? ভগবানের মহত্ত্ব শ্রদ্ধাভাবের ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয়।

যাঁরা মূর্তিপূজা করেন তাঁদের 'মূর্তিতে ভগবান আছেন', এই বিশ্বাস পূর্ণভাবে না থাকার জন্যই অধার্মিক ব্যক্তি মূর্তি ভাঙতে চায় এবং ভগবানও তাঁর মহিমা তাদের কাছে প্রকাশ করেন না। আবার যে সব ভক্তের 'মূর্তিতে ভগবান আছেন' এরূপ দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে, সেখানে ভগবান নিজ মহিমা প্রকাশ করেন। যেমন, গুজরাটে সুরাটের কাছে এক শিবের মন্দির আছে। তাতে যে শিবলিঙ্গ আছে, তাঁর গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র। তার কারণ যখন মুসলমানেরা সেই শিবলিঙ্গটি ভাঙতে এসেছিল

তখন সেই লিঙ্গ থেকে অসংখ্য বড় বড় ভ্রমর বেরিয়ে দুর্বৃত্তদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

যে ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করতে চায়, সে-ই পরীক্ষককে সম্ভ্রম জানায়, তাঁর আজ্ঞাবহ হয় ; কারণ পরীক্ষক যদি উত্তীর্ণ করান তবে সে উত্তীর্ণ হবে আর বিরূপ হলে অনুত্তীর্ণ থেকে যেতে হবে। কিন্তু ভগবানের কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দরকার হয় না, কারণ তাতে তাঁর মহত্ত্ব কিছু বাড়বে না। আবার উত্তীর্ণ না হলেও তাঁর মহত্ত্ব কিছুমাত্র কমবে না। রাবণ যখন ভগবান রামের পরীক্ষা নেবার জন্য মায়াবী মারীচকে স্বর্ণমৃগ করে পাঠিয়েছিলেন তখন ভগবান রাম স্বর্ণমৃগের পিছনে দৌড়েছিলেন অর্থাৎ রাবণের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছিলেন, দুষ্ট রাবণের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে ভগবানের কোনো প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন ছিল কী ? সেইভাবেই অসৎ লোকেরা ভগবানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মন্দির ভাঙেন এবং ভগবান তাঁদের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন, তাঁদের সামনে নিজ প্রভাব প্রকাশিত করেন না, কারণ অসৎ লোকেরা অসৎভাব নিয়েই তাঁর সম্মুখীন হয়ে থাকে।

একটিকে বস্তুগুণ এবং অপরটিকে ভাবগুণ বলা

হয়। এই দুটি গুণ পৃথক । যেমন স্ত্রী, মা এবং বোন —এদের তিনজনের শরীর একই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীর শরীর যেমন, মায়েরও তেমন এবং বোনের শরীরও সেই একই রকমে গঠিত। অতএব এই তিনেতেই বস্তুগুণ অভিন্ন। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি একভাব, মায়ের প্রতি আরেক ভাব এবং বোনের প্রতি অন্যপ্রকার ভাব থাকে। সুতরাং বস্তুগুণ একপ্রকার হলেও ভাবগুণ পৃথক্ পৃথক্ হয়ে থাকে। জগতে বিভিন্ন স্বভাবের ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদি আছে, অতএব তাদের বস্তুগুণ বিভিন্ন, কিন্তু সবার মধ্যেই ভগবান পূর্ণরূপে আছেন—এই ভাবগুণটি একই। এইরূপ মূর্তিতে যাঁর শ্রদ্ধা আছে, তাঁর মধ্যে 'মূর্তিতে ভগবান বিরাজ করেন,'—এই ভাবগুণ থাকে। মূর্তিতে যাঁর শ্রদ্ধা নেই, তিনি 'মূর্তি পাথর, পিতল, রূপো ইত্যাদির তৈরি'—এই বস্তুগুণসম্পন্ন হন। এর বিশেষত্ব এই যে, পূজকের যদি মূর্তিতে ভগবৎভাব থাকে তাহলে তাঁর কাছে মূর্তি সাক্ষাৎ ভগবানই। যদি পূজকের ভাব এই হয় যে, মূর্তি পিতলের, পাথরের বা রূপার তাহলে তার কাছে সেই মূর্তি কেবলমাত্র পাথর বা পিতল ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হয়। কারণ ভগবান ভাবেই বিরাজিত—

ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন শিলায়াং ন মৃৎসু চ।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবং সমাচরেৎ॥
(গরুড়পুরাণ, উত্তরখণ্ড ৩।১০)

দেবতা কাঠেও থাকেন না এবং পাথর বা মাটিতেও না, ভাবেই দেবতার বাস, সেইজন্য ভাবকেই প্রধানরূপে মানা উচিত।

এক বৈরাগী বাবাজী ছিলেন। তাঁর কাছে দুটি স্বর্ণের মূর্তি ছিল। একটি গণেশের অপরটি ইঁদুরের। দুটির ওজনই সমান সমান ছিল। বাবাজী একবার রামেশ্বর তীর্থে যাওয়া স্থির করলেন। সেইজন্য তিনি এক স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভাই ! এই মূর্তি দুটির বদলে কত টাকা দেবে ?' স্বর্ণকার সেই দুটিকে ওজন করে দুটিরই পাঁচশত টাকা করে দাম, অর্থাৎ দুটিই সমমূল্যের বলে জানাল। বাবাজী বললেন, 'আরে ! তুমি দেখতে পাচ্ছ না, একজন প্রভু, অপরটি তাঁর বাহন ? যা দাম গণেশের সেই একই দাম ইঁদুরের ? তা কেমন করে হয় ?' স্বর্ণকার উত্তর দিলেন, 'বাবাজী ! আমি গণেশজী আর তাঁর ইঁদুরের দাম বলিনি, আমি তো সোনার দাম বলেছি।' এর তাৎপর্য হল যে, বাবাজীর দৃষ্টি ছিল গণেশ এবং ইঁদুরের ওপর আর স্বর্ণকারের দৃষ্টি ছিল সোনার

ওপর অর্থাৎ বাবাজী ভাবগুণ দেখেছেন, আর স্বর্ণকার বস্তুগুণ বিচার করেছেন। তেমনি যারা মূর্তি ভাঙে তারা বস্তুগুণ দেখে অর্থাৎ সেটি পাথরের না পিতলের —এরূপই বিচার করে। ভগবানও তাদের ধারণা অনুযায়ী পাথর ইত্যাদি রূপেই অবস্থান করেন।

বাস্তবে দেখতে গেলে স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সমস্ত কিছুই ভগবৎস্বরূপই। যাঁর মধ্যে ভাবগুণ অর্থাৎ ভগবানের ভাবনা আছে তিনি সব কিছুই ভগবৎস্বরূপ দেখতে পান। কিন্তু যাঁর মধ্যে বস্তুগুণ অর্থাৎ জড়বস্তুর ভাবনা-চিন্তা থাকে, তিনি স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সবকিছুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখেন। এই কথাই মূর্তির বিষয়েও বুঝে নিতে হবে।

মানুষ শ্রদ্ধা-ভাব রেখে মূর্তির পূজা করে, স্তুতি ও প্রার্থনা করে। কারণ সে মূর্তির মধ্যে বিশেষ ভাব দেখতে পায়। যে ব্যক্তি মূর্তি ভাঙে, সেও মূর্তির মধ্যে তারই মতো অবশ্যই কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করে। যদি তা না হয়, তাহলে সে মূর্তিগুলি ভাঙবেই বা কেন ? অন্য পাথর ইত্যাদি ভাঙে না কেন ? সুতরাং সেই ব্যক্তিও অবচেতন মনে মূর্তিতে বিশেষত্ব আছে বলেই মানে। শুধু মূর্তিতে যাঁরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখেন তাঁদের উপর ঈর্ষাবশত, তাঁদের

দুঃখ দেবার জন্য তারা মূর্তি ভাঙে।

যে সব ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি অনুসারে নির্মিত মন্দির এবং সেখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে স্থাপিত মূর্তিগুলি ভগ্ন করে ; তারা নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করার জন্য, পূজকদের মর্যাদা নষ্ট করার জন্য, নিজ অহংকার ও নাম স্মরণীয় করার জন্য এবং ভগ্নমূর্তি দর্শনে বহু প্রজন্ম পর্যন্ত হিন্দুদের যন্ত্রণায় দগ্ধ করার জন্যই হিংসাবশতঃ তা করে। এর পরিণামে তারা ঘোর নরকে পতিত হয় ; কেননা তাদের মানসিকতাই হচ্ছে অন্যকে দুঃখ দেওয়া, অন্যকে নাশ করা। খারাপ উদ্দেশ্যের ফলও খারাপই হয়। আবার যে সব ব্যক্তি মন্দির এবং মূর্তিগুলি রক্ষা করার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন, নিজেদের প্রাণ সমর্পণ করেন—তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ হওয়ায় তাঁরা সদ্গতি প্রাপ্ত হন।

আমরা যখন কোনো বিদ্বান ব্যক্তিকে সম্মান জানাই, তাতে আমরা তাঁর বিদ্যাকেই সম্মান জানালাম, রক্তমাংসের শরীরটিকে নয়। এইরূপই যে ব্যক্তি মূর্তিতে ভগবানকে মানেন, তাঁরা আসলে ভগবানকেই সম্মান জানিয়ে থাকেন, মূর্তিকে নয়। সুতরাং যাঁরা ভগবানকে মানেন না, তাঁদের নিকট ভগবানের মহিমা প্রকাশিত হতে পারে না। অপরপক্ষে যাঁরা মূর্তিতে ভগবান মানেন, তাঁদের নিকট ভগবানের মহিমা প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন—আমরা মূর্তিপূজা কেন করব ? মূর্তিপূজার আবশ্যকতা কী ?

উত্তর—নিজের ঈশ্বরানুরাগের একনিষ্ঠতা আনাবার জন্য, তা জাগ্রত করার জন্য এবং ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য মূর্তিপূজা করা উচিত। আমাদের অন্তঃকরণে সংসারের যে বিশেষ রূপ অঙ্কিত আছে, যে মমতা-আসক্তি ইত্যাদি আছে, তা দূর করার জন্য ঈশ্বরের পূজা করা উচিত। ফুলমালা দিয়ে মূর্তিকে সাজানো, সুন্দর বস্ত্রাদি পরানো, আরতি করা, নৈবেদ্য নিবেদন করা ইত্যাদির খুবই প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ মূর্তিপূজার দ্বারা আমাদের দুই প্রকার লাভ হয়—ভগবৎভাব জাগ্রত হয় তথা বৃদ্ধি পায় এবং সাংসারিক বস্তুর প্রতি মমতা ও আসক্তি দূর হয়।

মানুষের জীবনে অন্তত এমন একটি জায়গা (আশ্রয়) থাকা প্রয়োজন যার জন্য সে নিজের সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। সেই স্থান হতে পারে ভগবান বা কোনো সাধু-মহাত্মা বা হতে পারে মাতা-পিতা বা আচার্য-শিক্ষক। এর ফলে মানুষের পার্থিব চিন্তার ভার কমে যায়

এবং ধার্মিক তথা আধ্যাত্মিক ভাবের বৃদ্ধি হয়।

একবার কয়েকজন তীর্থযাত্রী কাশী পরিক্রমা করেছিলেন। সেখানকার এক পাণ্ডা তাঁদের মন্দিরের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছিলেন, শিবলিঙ্গকে প্রণাম করাচ্ছিলেন এবং পূজাআচ্চা করাচ্ছিলেন। সেই যাত্রীদের মধ্যে কিছু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছোক্‌রা ছিল। তাদের বারে বারে প্রণাম করা ইত্যাদি পছন্দ হচ্ছিল না। তাই তারা পাণ্ডাকে বলল, 'পাণ্ডাজী ! স্থানে স্থানে মাথা ঠুকে কী লাভ ?' সেখানে এক সাধু দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তাদের বললেন, 'ভাই, যেমন এই রক্ত-মাংসের মধ্যে তোমরা আছ, এই মূর্তির মধ্যে তেমনি ভগবান আছেন। তোমাদের বয়স তো অল্প, কিন্তু এই শিবলিঙ্গ বহু বছরের, সুতরাং বয়সের দৃষ্টিতে এই শিবলিঙ্গ তোমাদের থেকে বড়। শুদ্ধতার দৃষ্টিতে দেখলে রক্ত-মাংস অশুদ্ধ কিন্তু পাথর শুদ্ধ। স্থায়িত্বের কথা ভাবলে শরীরের থেকে পাথর অনেক বেশি মজবুত। যদি পরীক্ষা করতে চাও তো নিজের মাথা পাথরে ঠুকে দেখতে পারো তোমাদের মাথা ভাঙে, না মূর্তি ! তোমাদের মধ্যে অনেক প্রকারের দুর্গুণ বা দুরাচার থাকতে পারে, মূর্তিতে কিন্তু কোনো দুর্গুণ বা দুরাচার নেই। তাই যে ভাবেই দেখ না কেন মূর্তি সব

প্রকারেই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং মূর্তি পূজনীয়। তোমরা তোমাদের নামের নিন্দাকে নিজের নিন্দা এবং নামের প্রশংসাকে নিজের প্রশংসা বলে মনে কর ; শরীরের অনাদরে নিজেদের অনাদর এবং শরীরের আদরে নিজেদের আদর বলে মনে কর। তাহলে মূর্তিতে ভগবানের পূজা, স্তুতি, প্রার্থনা ইত্যাদি করলে ভগবান কি সেই পূজা, স্তুতি, প্রার্থনাকে গ্রহণ করবেন না ? আরে ভাই ! লোকে তোমাদের যে নাম ও রূপের সম্মান করে, তা তোমাদের স্বরূপ নয়, তবু তাতে তোমরা খুশি হও। ভগবানের স্বরূপ তো সর্বব্যাপী, অতএব এই মূর্তিতেও তাঁর স্বরূপ বিরাজিত। কাজেই আমরা যদি এই মূর্তিকে পূজা করি, তবে কি তিনি প্রসন্ন হবেন না ? আমরা যত বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর পূজা করব, তিনি তত বেশি প্রসন্ন হবেন।'

কোনো আস্তিক ব্যক্তি যদি মূর্তিপূজায় অনিচ্ছুকও হন তবুও তাঁর দ্বারা প্রকারান্তরে মূর্তিপূজা হয়ে থাকে। কেমন করে ? তিনি যদি বেদাদি গ্রন্থ মানেন এবং সেই অনুসারে চলতে মনস্থ করেন, তাহলে প্রকারান্তরে তাঁর দ্বারা মূর্তিপূজাই হয়। কারণ বেদও (লিখিত পুস্তক হিসাবে) তো মূর্তিই। বেদ ইত্যাদি গ্রন্থকে সম্মান

জানানোও একপ্রকার মূর্তিপূজা। এই রূপেই মানুষ গুরু, মাতা-পিতা, অতিথি প্রমুখের যে সম্মান করে ও সৎকার করে, অন্ন-জল-বস্ত্রাদি দ্বারা সেবা করে—এসবই মূর্তিপূজা। কারণ গুরু, মাতা-পিতা প্রমুখের দেহ জড় হলেও সেই দেহকে সম্মান জানালে তাঁদেরই সম্মান জানানো হয়, ফলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। এর তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ যখন কাউকে কোনোরূপে সম্মান বা শ্রদ্ধা করে তা মূর্তিপূজারই নামান্তর হয়ে ওঠে। মানুষ যদি ভাবদ্বারা মূর্তিতে ভগবৎপূজন করে তা হলে তাও ভগবানেরই পূজা হয়।

এক বৈরাগী বাবাজী ছিলেন। তিনি একটি বারান্দায় থাকতেন ও সেইস্থানেই শালগ্রাম শিলার পূজা করতেন। যারা মূর্তিপূজা মানতো না তাদের বাবাজীর মূর্তিপূজাদির ক্রিয়াকলাপ পছন্দ হতো না। সেইসময় সেখানে হুকসাহেব নামে একজন ইংরেজ অফিসার এসেছিলেন। সেই অফিসারের কাছে লোকেরা নালিশ করল যে, সাধুটি মূর্তিপূজা করে সর্বব্যাপী পরমাত্মার অপমান করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। হুকসাহেব ক্রোধান্বিত হয়ে বাবাজীকে ডাকলেন এবং তাঁকে সেই স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। পরের দিন বাবাজী হুকসাহেবের

এক মূর্তি তৈরি করে সারা শহর ঘুরতে লাগলেন। সবাইকে দেখিয়ে সেই মূর্তিতে জুতো মারতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন যে, হুকসাহেব একেবারে বেআক্কেল, এর কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই ইত্যাদি। লোকেরা তাই দেখে আবার হুকসাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করল যে, বাবাজী তাঁকে গালি দিচ্ছেন এবং তাঁর মূর্তি তৈরি করে তাতে জুতো মারছেন। হুকসাহেব বাবাজীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার অপমান করছ কেন ?' বাবাজী বললেন, 'আমি আপনার কোনোরকম অপমান করিনি, আমি তো এই মূর্তির অপমান করছি, কেননা এ বড় মূর্খ।' এই বলে তিনি সাহেবের সামনেই আবার মূর্তিতে জুতো মারলেন। হুকসাহেব বললেন, 'আমার মূর্তিকে অপমান করা মানেই আমার অপমান করা।' বাবাজী বললেন, 'আপনি এই মূর্তিতে অবস্থিত নন, তবুও শুধুমাত্র উপলক্ষ্যরূপে মূর্তির অপমান করলে তার প্রভাব আপনার উপর পড়ছে। আমার ভগবান সর্বত্র, সর্বকালে সর্ব বস্তুতে বিরাজিত। সুতরাং কেউ যদি শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁর মূর্তিতে পূজা করে তাহলে ভগবান কি প্রসন্ন হন না ? আমি যদি মূর্তিতে ভগবানকে পূজা করি তবে তাতে তাঁর সম্মান করা হয়,

না অসম্মান ?' হুকসাহেব বললেন, 'যাও, তুমি এখন থেকে নির্ভয়ে মূর্তিপূজা করতে পারো।' বাবাজী সানন্দে নিজ স্থানে গমন করলেন।

প্রশ্ন—কিছুলোক মন্দিরে অথবা মন্দিরের কাছে বসে মাংস, মদ ইত্যাদি নিষিদ্ধ জিনিস খায়, তবুও ভগবান তাদের বাধা দেন না কেন ?

উত্তর—মা-বাবার সামনে শিশুরা দুষ্টুমি করলে তো মা-বাবা তাদের দণ্ড দেন না ; কারণ তাঁরা জানেন, 'এরা আমাদেরই সন্তান, অবুঝ, ন্যায়-অন্যায় কিছু জানে না।' এইরূপ ভগবানও জানেন যে, 'এরা আমারই অবুঝ সন্তান।' তাই ভগবানের দৃষ্টি তাদের আচার-ব্যবহারের দিকে যায় না। কিন্তু যারা মন্দিরে নিষিদ্ধ পদার্থ সেবন করে ও নিষিদ্ধ আচরণ করে, তাদের এই অন্যায়-কর্মের ফলভোগ অবশ্যই করতে হবে।

প্রশ্ন—পূর্বে কবীরাদি কিছু সন্ত-মহাপুরুষগণ মূর্তিপূজা নিষেধ করেছিলেন কেন ?

উত্তর—যে সময়ে যেটি প্রয়োজন হয়, সাধু এবং মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়ে তখন সেইরূপ কার্য করেন। যেমন, পূর্বে যখন শৈব এবং বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে প্রচুর কলহ হোত, সেই সময় তুলসীদাসজী

'শ্রীরামচরিতমানস' রচনা করলেন, যার ফলে দুই পক্ষের ভক্তগণের কলহ দূর হয়। গীতার ওপরও অনেক টীকা রচিত হয়েছে, কারণ যে সময় যেমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, মহাপুরুষগণের হৃদয়ে তেমনি প্রেরণা জেগেছে এবং তাঁরা গীতার ওপর সেইরূপ টীকা রচনা করেছেন। যে সময়ে বৌদ্ধ মতের বাড়াবাড়ি, তখনই শংকরাচার্য আবির্ভূত হলেন এবং সনাতন ধর্ম প্রচার করলেন। এইরূপ যখন মুসলমানদের শাসন ছিল, তখন শাসকশ্রেণী মন্দির, দেবমূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ করত। অতএব সেই সময় কবীর আদি মহাপুরুষগণ বলেছিলেন, 'আমাদের মন্দিরের বা মূর্তিপূজার কোনো প্রয়োজন নেই ; কারণ পরমাত্মা কেবল মন্দির বা মূর্তিতে থাকেন না, তিনি সর্বস্থানে বিরাজিত রয়েছেন। আসলে ঐ সন্তগণের মূর্তিপূজা বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না ; তাঁরা যে কোনো ভাবে জনসাধারণের মনকে পরমাত্মার দিকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন।'

প্রশ্ন—এখন তো সময় বদলে গেছে, মুসলমানেরা মন্দির বা মূর্তি ভাঙছে না, তবুও কেন সেই সম্প্রদায়ের অনুগামীরা মূর্তিপূজা বা সাকার ঈশ্বর-রূপের বিরোধিতা করে ?

উত্তর—নিজ মতবাদের প্রচার-প্রতিষ্ঠার আগ্রহ থাকার জন্যই অপরের মতকে খণ্ডন করা হয়ে থাকে। কারণ এখন যেসব ব্যক্তি মন্দির, মূর্তিপূজা বা অপরের মতবাদকে খণ্ডন করতে চায়, সেই বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিরা আসলে পরমাত্মতত্ত্বকে চায় না, নিজ উদ্ধার চায় না, তারা নিজেদের পূজা চায়, নিজেদের দল ভারী করতে চায়, নিজেদের সাম্প্রদায়ের প্রসার চায়। এইরূপ মতবাদীদের ঈশ্বর লাভ হয় না। যারা নিজেদের মতেই শুধু আগ্রহী থাকে, তারা গোঁড়া হয় এবং তাদের কথা গ্রহণীয় হয় না—

বাতুল ভূত বিবস মতবারে।
তে নহিঁ বোলহিঁ বচন বিচারে॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৫।৪)

এইরূপ **'মতবাদী'** ব্যক্তি আসল তত্ত্ব জানতে পারে না—

হরীয়া রত্তা তত্ত্বকা, মতকা রত্তা নাঁহি।
মত কা রত্তা সে ফিরৈ, তাঁয় তত্ত্ব পায়া নাঁহি॥
হরিয়া তত্ত্ব বিচারিয়ৈ ক্যা মত সেতী কাম।
তত্ত্ব বসায়া অমরপুর, মত কা যমপুর ধাম॥

নিরাকার-মার্গের সাধক যদি সাকারবাদীর মূর্তির

অবজ্ঞা করেন তাহলে তিনি নিজ ইষ্টদেবকেই হেয় করেন। কারণ তাঁর নিজ ধারণা অনুযায়ী এটাই প্রমাণিত হয় যে, যেস্থানে সাকার দেবতা আছেন সে স্থানে তার নিরাকার দেবতা নেই, অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী নন, পরিচ্ছিন্ন বা একস্থান নিবাসী। যদি তিনি মনে করেন যে সাকার মূর্তির মধ্যেও নিজ নিরাকার ইষ্ট আছেন, তাহলে তিনি সাকার দেবতাকে অবজ্ঞা কেন করবেন ? দ্বিতীয় কথা, নিরাকার উপাসনাকারীরা মনে করেন, 'পরমাত্মা সাকার নন, তাঁর অবতারও হয় না, মূর্তিও না', তাহলে তাঁদের সর্বসমর্থ পরমাত্মা অবতার দেহ ধারণ করতে, সাকার হতে অসমর্থ বা কমজোরী, অর্থাৎ তাঁদের পরমাত্মা তাহলে সর্বসমর্থ নন। বাস্তবে পরমাত্মা এরকম নন। পরমাত্মা সাকার, নিরাকার উভয় রূপেই বিরাজমান—**'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯) । অতএব গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, আমরা নিজেদের কল্যাণ চাইব, না সাকার-নিরাকার মতবাদ নিয়ে অযথা বিবাদ করব ? যদি আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী সাকার বা নিরাকারের পূজা করি তাহলে তাতেই আমাদের কল্যাণ সাধিত হবে।

তেরে ভাবৈ জো করৌ, ভলৌ বুরৌ সংসার।
'নারায়ন' তু বৈঠিকে, আপনৌ ভুবন বুহার॥

যদি ঝগড়া-বিবাদই করতে হয় তাহলে দুনিয়ায় ঝগড়া-বিবাদ করার অনেক কিছুই আছে। ধন-সম্পত্তি, জমি, বাড়ি-ঘর ইত্যাদির জন্য লোকে তো ঝগড়া-বিবাদ করেই থাকে, এই পারমার্থিক পথে এসে আবার বিবাদ কিসের ? আমি সাকার বা নিরাকার উপাসনায় যদি আত্ম-নিবেদিত থাকি তবে অপরের মতবাদ খণ্ডন করার আমার সময় কোথায় ? অপরের মতবাদ খণ্ডন করতে যে সময় ব্যয় হয় সেই সময়টুকু যদি নিজ ইষ্টের উপাসনায় ব্যয় করি তবে আমার অনেক মঙ্গল হবে।

অপরের মতবাদ খণ্ডন করার তাৎপর্য হল নিজের উপাস্যকে অবজ্ঞা করবার জন্য অপরকে আমন্ত্রণ করা। এর ফলে আমার ক্ষতিই হবে। আমি যখন অন্যের নিরাকার মতবাদ খণ্ডন করলাম তখন তো আমি নিজ সাকার ইষ্টকে অবজ্ঞা করার জন্যই তাকে নিমন্ত্রণ করলাম, তাকে সুযোগ দিলাম যে, 'এবার তুমি আমার সাকারবাদ খণ্ডন করো'। এই মতবাদ খণ্ডনের দ্বারা না আমার কিছু লাভ হয়, না অপরের। দ্বিতীয় কথা, অপরের মতবাদ খণ্ডন করলে নিজের যে কিছুমাত্র কল্যাণ হয়

একথাও কেউ লেখেনি। যাঁরা অপরের মতবাদ খণ্ডন করেছেন, তাঁরাও বলেননি যে, অপরের মতবাদ খণ্ডন করলে তোমার ভালো হবে, কল্যাণ হবে। আমি যদি কারো মতবাদ বা উপাস্যকে খণ্ডন করি তাহলে আমার অন্তঃকরণ অপবিত্র হবে, খণ্ডনের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে দ্বেষ সৃষ্টি হবে, যার ফলে আমার পূজা-উপাসনাতে বাধার সৃষ্টি হবে এবং আমি ইষ্টের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ব। সুতরাং মানুষের কারো মত বা ইষ্টভাবের খণ্ডন করা উচিত নয়, কাউকে অপমান, ভর্ৎসনা করা উচিত নয়, কারণ সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ভাব এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ ইষ্টের উপাসনা করেন। পরমাত্মা সাধকের ভাব, অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাসেই সাড়া দেন। অতএব নিজের মতে, উপাস্য দেবতায় শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রেখে সেই মত অনুযায়ী তৎপরতার সঙ্গে সাধনে রত থাকা প্রধান কর্তব্য। এটিই হল পরমাত্মাকে লাভ করার উপায়। অপরের মত খণ্ডন করা বা অপমান করা পরমাত্ম-প্রাপ্তির পথ নয়, তা পতনেরই পথ।

যে সমস্ত মহাপুরুষ মূর্তিপূজার মতবাদ খণ্ডন করেছেন তাঁরা সেই স্থানে নাম-জপ, সৎসঙ্গ, গুরুবাণী, ভগবৎ-চিন্তন, ধ্যান ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব

দিয়েছেন। অতএব যাঁরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছেন অথচ নিজের মতানুসারে নাম-জপ ইত্যাদিতে তৎপরতার সঙ্গে সাধন শুরু করেননি, তাঁরা দুই দিক থেকেই রিক্ত হন। তাঁদের থেকে মূর্তি পূজনকারী শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি নিজ মতানুযায়ী তাঁর সাধনায় রত রয়েছেন।

এর পরেও যদি কেউ বলে যে, 'অপর ব্যক্তির মতবাদ খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি নিজের উপাসনাকে দৃঢ় করছি, নিজের অনন্য ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করছি'—তবে এর উত্তর হচ্ছে যে, অপরের মতবাদ খণ্ডন করলে নিজের অনন্য ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না। অনন্যভাব হচ্ছে এই যে, আমার ইষ্ট ছাড়া দ্বিতীয় কোনো তত্ত্বই নেই। আমার প্রভু সগুণও এবং নির্গুণও। সবই আমার প্রভুর রূপ। অপরে প্রভুর যা খুশি নাম দিক না কেন তিনি আমারই প্রভু ! আমার প্রভুকে অনেক রূপে বিভিন্নভাবে উপাসনা করা হয়। অতএব যিনি নির্গুণকে মানেন তিনি আমার সগুণ প্রভুর মহিমা বাড়ান ; কেননা আমার সগুণ প্রভুই ওদের কাছে নির্গুণ। তাই যাঁরা নির্গুণের উপাসনা করেন তাঁরা আমাদের কাছে সম্মাননীয় ব্যক্তি। এইরূপ করলেই অনন্যভাব হয়। কোনো মতবাদ খণ্ডন করা অনন্যভাব তৈরির সাধন নয়।

যিনি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসপূর্বক, সহজ-সরল ভাবে নিজের ইষ্টের উপাসনায় মগ্ন থাকেন, তাঁর ইষ্টের, তাঁর উপাসনায় ব্যাঘাত করলে তাঁর হৃদয়ে আঘাত লাগে, তিনি ব্যথিত হলে ব্যাঘাতকারীর খুব অপরাধ হয়, যার ফলে তার সাধনা সিদ্ধ হয় না।

অনন্যতার নামে অপরের মতবাদ খণ্ডন করা ভালোত্বের অজুহাতে মন্দ করা। খারাপ রূপে যদি খারাপ জিনিস উপস্থিত হয়, তা হলে লোকে তার থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু ভালোত্বের ছদ্মবেশে যখন মন্দ উপস্থিত হয়, তখন তার থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন সীতার কাছে রাবণ ও হনুমানের কাছে কালনেমিরাক্ষস সাধুর বেশে এসেছিল বলে সীতা এবং হনুমান দুজনেই প্রতারিত হয়েছিলেন। অর্জুন যুদ্ধরূপী ঘোর কর্মের অজুহাতে নিজের কর্তব্য ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন—'দুর্যোধনেরা ধর্ম কি তা জানে না, ওদের লোভ গ্রাস করেছে। কিন্তু আমি জানি ধর্ম কি, আমার লোভ নেই, আমি অহিংসক' ইত্যাদি। এভাবে অর্জুনের মধ্যেও ভালোর অজুহাতে (অছিলায়) মন্দ এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেই মন্দমতিকে দূর করার জন্য ভগবানকে যথেষ্ট প্রয়াস করতে হয়েছে, সুদীর্ঘ উপদেশ দিতে

হয়েছে। যদি ভালোত্বের ছদ্মবেশে অর্জুনের মধ্যে এই মন্দ না আসত, তাহলে তা দূর করতে এত সময় লাগত না। এইরূপ একনিষ্ঠতার অজুহাতে যদি অপরের মতবাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব আসে আর আমরা আমাদের অমূল্য সময়, সামর্থ্য, বুদ্ধি ইত্যাদি অপরের মতবাদ খণ্ডনে ব্যয় করি, তাহলে আমাদের পতনই হবে। অতএব সাধকের উচিত তিনি যেন সাবধানতার সঙ্গে নিজ সময়, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদি নিজের ইষ্টের উপাসনায় নিবিষ্ট রাখেন।

প্রশ্ন—ভগবানের স্বয়ম্ভু মূর্তি কীভাবে তৈরি হয় ?

উত্তর—স্বয়ম্ভু মূর্তি যদি তৈরি হয় তবেই এই প্রশ্ন ওঠে। স্বয়ম্ভু মূর্তি তৈরীই হয় না, তিনি স্বয়ং প্রকটিত হন। তাই তাঁর নাম স্বয়ম্ভু, নাহলে তিনি স্বয়ম্ভু কী করে হলেন ?

প্রশ্ন—মূর্তি স্বয়ম্ভু বা কারো দ্বারা তৈরি, তা কী করে চেনা যায় ?

উত্তর—সকলেই তা চিনতে পারেন না। যেমন কোনো ব্যক্তি একটি মানুষকে একবার যদি দেখে, পরে আবার দেখা হলে তাকে চিনতে পারে। তেমনি যিনি

ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, তিনিই স্বয়ম্ভু মূর্তি চিনতে পারেন।

প্রশ্ন—স্বয়ম্ভু মূর্তি এবং তৈরি করা মূর্তির দর্শন, পূজা ইত্যাদির মহিমা কিরূপ ?

উত্তর—শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস যদি থাকে, তাহলে 'দর্ভে' অর্থাৎ কুশে ঋষিদের এবং 'সুপারীতে' গণেশের পূজা করলেও লাভ হয়। তেমনি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যদি হয় এবং ভগবৎভাব যদি থাকে তাহলে তৈরি করা মূর্তির পূজা, দর্শন প্রভৃতিতে লাভ হয়। তবে স্বয়ম্ভু মূর্তিতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকলে বিশেষ ও শীঘ্র লাভ হয়। যেমন, কোনো সাধুর লিখিত পুস্তক পড়ার থেকে তাঁর মুখ হতে সরাসরি শোনায় বেশি লাভ হয়। সঞ্জয়ও গীতাগ্রন্থের বিষয়ে বলেছিলেন যে, 'আমি সাক্ষাৎ ভগবানকে এটি বলতে শুনেছি।' (১৮।৭৫)।

প্রশ্ন—সংসারের সব কিছুর সঙ্গে যেমন সহজ সরলভাবে এবং অনায়াসে সম্বন্ধ পাতানো যায়, ভগবানের সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ হয় না, এর কারণ কী ?

উত্তর—এর কারণ এই যে মানুষ শরীরকেই 'আমি' বলে মেনে নিয়েছে। নিজেকে শরীর বলে মনে করায় সংসারের সঙ্গে সহজে সম্বন্ধ তৈরি হয়ে যায়। কারণ

শরীর এবং সংসারের মধ্যে ঐক্য-ভাব আছে। যার সঙ্গে একত্ব বা সমজাতীয়ত্ব হয় তার সঙ্গে অনায়াসে সম্বন্ধ হয়ে যায়। যেমন যে নিজেকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বলে মনে করে, তার ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ইত্যাদির সঙ্গে এবং যে নিজেকে বিদ্বান বা ব্যবসায়ী ইত্যাদি বলে মনে করে তার বিদ্বান বা ব্যবসায়ী ইত্যাদির সঙ্গে সহজেই সম্বন্ধ হয়ে যায়—**'সমানশীলব্যসনেষু সখ্যম্'**। ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না এবং নিজেকে মূর্তি (শরীর) বলে জানে, কাজেই তার পক্ষে দেবমূর্তিতে ভগবানের ভাব আনাই সহজ। অতএব যতক্ষণ শরীরকে আমি বলে মনে করা যাবে ততক্ষণ মূর্তিতে ভগবৎপূজন অবশ্যই করা উচিত। ভগবৎপ্রাপ্তি হওয়ার পরেও মূর্তিপূজা ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা যে সাধনা দ্বারা মানুষ লাভবান হয় তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত, তা ত্যাগ করা উচিত নয়।
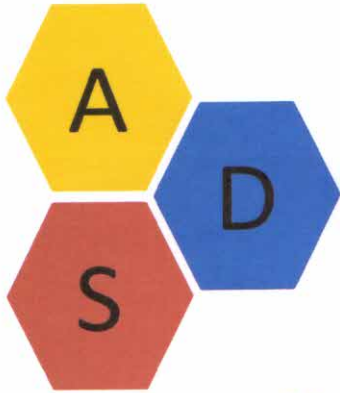
A = Amar

D = Dharma

S = Sanatan

Created by- Samir Kumar Mondal

http://amar-dharma-sanatan.blogspot.com